লোকসংগীত : সংজ্ঞা, স্বরূপ ও শ্রেণিবিভাগ

লোকসংগীত : লোকসংগীত ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান; সাধারণত পল্লীর নিরক্ষর জনগণ এর প্রধান ধারক। বিষয়, কাল ও উপলক্ষভেদে এ গানের অবয়ব ছোট-বড় হয়। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী ও আভোগ সম্বলিত দশ-বারো চরণের লোকসংগীত আছে; আবার ব্রতগান, মেয়েলী গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কবির লড়াই, আলকাপ গান, লেটো গান এবং যাত্রাগান হয় আরও দীর্ঘ, কারণ সারারাত ধরে এগুলি পরিবেশিত হয়।

বাংলা লোকসংগীতের নাম ও প্রকারভেদে বিচিত্র; অঞ্চলভেদে এর প্রায় শতাধিক নাম রয়েছে এবং প্রকারভেদে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশেরও বেশি গান । কেউ কেউ আঞ্চলিক ও সর্বাঞ্চলীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাধারণ ও তত্ত্বপ্রধান, তালযুক্ত ও তালহীন এরূপ স্থূলভাবে ভাগ করে সেগুলির আবার নানা উপবিভাগ করেছেন। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসংগীতকে আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক (ritual), কর্মমূলক ও প্রেমমূলক এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। বিষয়গত দিক থেকে একে প্রেম, ধর্ম-আচার-সংস্কার, তত্ত্ব ও ভক্তি, কর্ম ও শ্রম, পেশা ও বৃত্তি, ব্যঙ্গ ও হাস্যকৌতুক এবং মিশ্র এরূপ সাতটি ভাগ করা যায়।

নর-নারীর প্রেম অবলম্বন করে রচিত বাংলা : লোকসংগীত লৌকিক বা পার্থিব প্রেম এবং তত্ত্ব-ভক্তিমূলক গানে অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেমের কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অবলম্বনে রচিত আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, সারি গান, হোলির গান ইত্যাদিতে দেহজ কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। যেমন ‘বনে কানুর বাঁশি বাজিল রে’ (আলকাপ), ‘কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনি’ (ঘাঁটু গান), ‘শুন গো রাই, বলি তোরে’ (ঝুমুর), ‘মাঘ না মাসেতে মাধব মতুরায় গমন’ (বারোমাসি), ‘তুই মোরে নিদয়ার কালিয়া রে’ (ভাওয়াইয়া), ‘মন দুঃখে মরিবে সুবল সখা’ (বিচ্ছেদি গান), ‘সুন্দরী লো বাইরইয়া দেখ, শ্যামে বাঁশি বাজাইয়া যায় রে’ (সারিগান), ‘নিধুবনে শ্যাম কিশোর সনে খেলব হোলি আয়’ (হোলির গান) ইত্যাদি। এ গানগুলিতে রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, মথুরা, যমুনা, বাঁশি ইত্যাদি শব্দ থাকলেও তাতে ধর্মীয় ভাব বা আধ্যাত্মিকতা নেই, আছে মানবিকবোধ ও বৈষয়িক চেতনা। গাড়িয়াল, মৈষাল, মাহুত, মাঝি, সওদাগর, বানিয়া, নদী, হাওর প্রভৃতি বাংলার পেশাজীবী মানুষ ও প্রকৃতি নিয়েও এ ধরণের গান রচিত হয়। ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে’ (ভাওয়াইয়া), ‘আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু’ (ওই), ‘আমার বাড়ি যান ও মোর প্রাণের মৈষাল রে’ (চটকা), ‘ও মোর বানিয়া বন্ধু রে’ (ওই), ‘সুজন মাঝি রে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোর নাও’ (ভাটিয়ালি), ‘সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া’ (সারিগান) ইত্যাদি গানে রূপক-প্রতীক নেই, আছে নিত্য পরিচিত মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির চিত্র।

জীবনের খন্ড খন্ড চিত্র কথায় ও সুরে অবলীলায় রূপ দিয়েছেন লোকশিল্পীরা। ‘গাও তোল গাও তোল কন্যা হে, কন্যা পিন্দো বিয়ার শাড়ি’, ‘ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া মাঝি পান খেয়া যাও’, ‘কত পাষাণ

বাইন্দ্যাছ পতি মনেতে', 'জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন', 'লাল নীল চউর বাইয়া, হাটে যাও রে সোনার নাইয়া' ইত্যাদি প্রেমসঙ্গীতে জীবনের খন্ডচিত্র আবেগের ভাষায় রূপ পেয়েছে।

দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দয়ালতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব নিয়ে রচিত হয় বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গান। প্রধানত বাউল, ফকির, বৈরাগী ও ভক্তশিষ্যগণ এসব গানের চর্চা করে থাকে। জীবন, সংসার ও জগৎকে অনিত্য এবং দুঃখময় ভেবে তারা আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও মুক্তি খোঁজে। কেউ সরাসরি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কেউ বা গুরু-মুর্শিদের নিকট আবেদন-নিবেদন করে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' (বাউল), 'মনমাঝি তোর বইঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না' (ভাটিয়ালি), 'ভবনদী পার করে দাও দয়াল মুর্শিদ আমারে' (মুর্শিদি), 'ও কি চমৎকার, ভান্ডারে এক আজব কারবার' (মাইজভান্ডারি গান) ইত্যাদি এরূপ তত্ত্বসংগীত। এগুলিতে সংসারবিমুখ ভাবের প্রতিফলন ও বিবাগী সুরের প্রতিধ্বনি আছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ভাদু, টুসু ও জাওয়া গান মূলত ব্রতকেন্দ্রিক। জাওয়া শস্যোদ্গমের, আর ভাদু শস্য তোলার উৎসব। প্রাচীন যুগে লোকসমাজের দৃষ্টিতে ভূমির শস্যবতী ও নারীর সন্তানবতী হওয়া ছিল অভিন্ন। কুমারী মেয়েরা নিজেদের সফল জীবনের আশায় ভাদু ব্রত পালন করে। এছাড়া হিন্দু নারীসমাজে আরও অনেক ব্রত আছে। সেসব ব্রতে সন্তান, সম্পদ ও জাগতিক সুখসমৃদ্ধি কামনা করে গান করা, ছড়া বলা ও আলপনা আঁকা হয়। কৃষির দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন ও গম্ভীরা উৎসব পালিত হয়। শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে রচিত গাজন গানে আসলে কৃষকজীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে। এ গানের দুটি ধারা একটিতে থাকে শিবের পারিবারিক জীবনচিত্র এবং অপরটিতে থাকে শিবের কাছে সাংসারিক জীবনের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের বিবরণ। 'ধান লাড় ধান লাড়, গোরী, আউলাইয়া মাথার কেশ' এটি প্রথম ধারার এবং 'শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান/ বুঝি বাঁচে না আর জান' এটি দ্বিতীয় ধারার গান। বর্তমানে গম্ভীরার এই ধারায় 'নানা-নাতি'র গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি এবং ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। এটি গম্ভীরার রূপান্তরিত নতুন আঙ্গিক।

ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ওঝা শ্রেণির শিরালিরা শিঙ্গা বাজিয়ে মন্ত্রধর্মী গান গেয়ে মেঘ তাড়ায়। এ প্রথা এক সময় ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে শিরালিরা বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বর্তমানে অবশ্য এ জাতীয় গান লুপ্তপ্রায়।

গোসম্পদ রক্ষার উদ্দেশে গোয়াইলার শিরনি ও গোরক্ষনাথের শিরনি আচার পালিত হয়। কৃষিকাজে গরুর ব্যবহার অপরিহার্য, তাই গরুর নিরাপত্তা কামনা করে শিরনি মানত করা হয়। এ উপলক্ষে রাখাল বালক ও অন্যান্য ছেলেমেয়ে দল বেঁধে ঘরে ঘরে যায় এবং গান গেয়ে শির্নীর চাল-ডাল-অর্থ সংগ্রহ করে; একে মাগনের গানও বলে।

হিন্দুসমাজে দেবদেবীর উদ্দেশে যেমন ব্রতের গান আছে, তেমনি মুসলমান সমাজেও আছে পীর-পীরানির উদ্দেশে জাগগান। পীরের মাহাত্ম্যসূচক এ গান দীর্ঘরাত্রি জেগে গাওয়া হয়। গাজী পীর, মাদার পীর, খোয়াজ-খিজির, মানিক পীর, সোনা পীর ও বদর পীর লোকদৃষ্টিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তাঁরা সন্তানহীনাকে সন্তানদান, রোগব্যাধি দূরীকরণ, ধনসম্পদ দান এবং গরুবাছুর রক্ষা করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়। মাগনের গানের মতো জাগগান গেয়েও শিরনির জন্য চাল-ডাল সংগ্রহ করা হয়। জাগগানে পীরমাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও তাতে ধর্মভাব আছে সামান্যই; বৈষয়িক চেতনা ও কল্যাণবুদ্ধিই মুখ্য। এগুলি আখ্যানধর্মী ও বিবৃতিমূলক বলে আকারে দীর্ঘ হয়। গাজী পীরের উদ্দেশে

নিবেদিত গান গাজীর গান নামে পরিচিত। সন্তান, স্বাস্থ্য ও সম্পদ কামনায় মানত করে গাজীর গানের পালা দেওয়ার রীতি আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাসংক্রান্ত জাগগানও আছে।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত জারিগান বা শোকসংগীত মুহরম উপলক্ষে গাওয়া হয়। কারবালার বিষাদময় কাহিনি অবলম্বনে ছোট ও বড় আকারের জারিগান প্রচলিত আছে। জারি গান ও নাচে শিয়া সম্প্রদায়ের মুহররমের মিছিল, তাজিয়া, দরগাহ, দুলদুল, ইমামবারা, মাতম, মর্সিয়া ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে। বিষয়বস্তুতে মৃত্যু, শোক, বিলাপ ও বিরহ থাকায় জারিগানে করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। মুহররম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও জারিগানে ধর্মীয় কোনো প্রভাব নেই; মানবহৃদয়ের চিরন্তন আর্তি ও বেদনার সুরই এতে ধ্বনিত হয়।

'কর্মসংগীত' - এই নামটির মাধ্যমেই বোঝা যায় যে, এগুলি শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জড়িত লোকসংগীত। কর্মে উৎসাহ দান, শ্রমভার লাঘব এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এ সংগীতের আয়োজন করা হয়। ক্ষেত নিড়ানো, ধান-পাট কাটা, ধান ভানা ইত্যাদি কৃষিকাজ ছাড়াও দাঁড় টানা, ছাদ পেটানো, জাল বোনা, তাঁত বোনা, মাটি কাটা, ভারি বস্তু টানা ইত্যাদি কাজেও কর্মসংগীতের প্রচলন আছে। কর্মের সঙ্গে সংগীতের কথা ও সুরের সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেমন 'আয় রে তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই', 'আমরা ধান ভানিরে ঢেকিতে পার দিয়া', 'রঙের নাও রঙের বৈঠা রঙে রঙে বাও' যথাক্রমে ক্ষেত নিড়ানো, ধান ভানা ও নৌকা বাইচের গান। এসব গানের কথা, ছন্দ ও সুরে ছড়িয়ে আছে জীবনের সাধ-আহ্লাদ, রস-রসিকতা, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি। শ্রমসংগীতে শাস্ত্রকথা ও নীতিকথার কোনো স্থান নেই।

নিম্নশ্রেণীভুক্ত পেশাজীবী পটুয়ারা কাগজ ও মাটির পাত্রে পট আঁকে এবং পটের চিত্র অনুযায়ী গান রচনা করে। গ্রামে-গঞ্জে পট দেখানোর সময় তারা এই গানগুলি গেয়ে অর্থোপার্জন করে। তাদের পটের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, নিমাই সন্ন্যাস, গাজী পীর ইত্যাদি। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 'পঞ্চকল্যাণী' নামক একটি পটে শিব, শ্যাম, সীতা, নিমাই ও অসতী নারীর চিত্র আছে। পটুয়া গানে ভাব নয়, ঘটনার বর্ণনাই প্রধান্য পায়। পটের চিত্র অনুযায়ী কথা সাজাতে হয় বলে এই ধরনের গানে শিল্পির স্বাধীনতা থাকে অল্পই।

পটুয়াদের মতো বেদেরাও বর্ষাকালে নৌকায় করে গ্রামগঞ্জে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সাপ ধরা, সাপ খেলা দেখানো ও ওঝাগিরি তাদের প্রধান জীবিকা। এ উপলক্ষে তারা মন্ত্র ও গান রচনা করে। 'সাপ খেলা দেখবি যদি আয় রে সোনা বউ/ এমনি খেলা সাপের খেলা দেখেনি তো কেউ' ঢাকা থেকে সংগৃহীত এই গানে সাপ খেলানোর চিত্র আছে। মনসা ও বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রসঙ্গ তাদের গানের প্রধান বিষয়।

পুতুলনাচ দেখিয়ে ও গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করে অপর এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ। পুতুলনাচের প্রকৃতি ও বিষয় অনুযায়ী এর গান হয় ছোট-বড়। পাঁচালি, কীর্তন ও মালসী সুরে এ গান পরিবেশিত হয়। মাঝেমধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। এতে অনেক সময় মানবজীবনের খন্ডচিত্র ফুটে ওঠে, যেমন: 'ও লো সুন্দরি! কার কথায় কইরাছো তুমি মন ভারি/ আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি' গানটিতে দাম্পত্য জীবনের একটি সরস চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

কবিগানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাহিনি বা সমস্যাদি স্থান পায়। দাঁড়া কবিগানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবিত বিষয় আলোচিত হয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি ধর্মীয় ও নীতিবিষয়ক হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যানকে 'সখী সংবাদ' এবং শ্যামার ভক্তিমূলক গানকে 'ভবানী বিষয়' বলে। কবিগানের 'খেউড়' অংশ আদি রসাত্মক ও

রুচিহীন। 'খিস্তি-খেউড়' কথাটির এখান থেকেই উৎপত্তি। দুই দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ধারায় কবির লড়াই চলে। উনিশ শতকে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কবিগানের উৎপত্তি হয়। পরে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবিগানের আসরে ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, বাদ্য ও ভঙ্গি সংযোগে একটি সাংগীতিক আবহ সৃষ্টি হয়। শ্রোতারা সারারাত ধরে তা শুনে মুগ্ধ হয় ও আনন্দ উপভোগ করে।

সারিগানের সঙ্গে নদী, নৌকা, মাঝি-মাল্লা, পারাপার ইত্যাদি বিষয় জড়িত। রাধা-কৃষ্ণ, গৌরী-মেনকা ও রাম-সীতার লীলাবিষয়ক পুরাণাশ্রিত গান, নিমাই সন্ন্যাসমূলক ইতিহাসাশ্রিত গান এবং নর-নারীর প্রেম-বিরহমূলক বাস্তব জীবনাশ্রিত গান সারিগানের অন্তর্ভুক্ত। নৌকাবাইচ উপলক্ষে গীত সংগীতসমূহ সারিগানের প্রধান অংশ, তবে সাধারণভাবে দাঁড়-গুণ টানা বা পাল তুলে নৌকা চালানোর সময়ও এ গান গাওয়া হয়। নৌকাবাইচের গান বেশ জীবনরসসিক্ত, তাত্ত্বিক ও উদ্দীপনামূলক। 'আষাড়িয়া নয়া পানি আইল রে ভাই দেশেতে/ আয় রে ও ভাই আয় রে সবাই আয়রে ডিঙ্গা বাইতে', 'মন পবনে বেগ উঠ্যাছে ভক্তির বাদাম দেও নৌকায়', 'শ্যাম কালিয়া তোর পিরীতে মইলাম জ্বলিয়া/ ডিঙ্গা সাজাও মাঝিভাই যমুনাতে যাই' ইত্যাদি গানে বিষয়, সুর, তাল ও ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সারিগান বাংলাদেশে এখনও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত।

মেয়েলী গীত নারীসমাজের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ভাব-আলেখ্য। কন্যা-জায়া-জননীরূপে পরিবারে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে সংসার-সাগরে যে ভাবরাশি উত্থিত হয়, মেয়েলি গীত তার বাঙ্ময় প্রকাশ। কুমারী জীবন, বিবাহিত জীবন ও সংসার জীবনের সুখ-দুঃখময় নানা ঘটনা ও বিচিত্র ভাব নিয়ে মেয়েলি গীত রচিত হয়। বিবাহ উপলক্ষে রচিত মেয়েলি গীতের সংখ্যা সর্বাধিক। কনে দেখা থেকে শুরু করে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান ফিরানি পর্যন্ত প্রায় সবস্তরের আচার-অনুষ্ঠানে এ গান গাওয়া হয়। এ সময় পল্লিরমণীরা ঢেঁকি, যাঁতা ও পাটায় কাজ করে এবং গান গেয়ে সারারাত কাটিয়ে দেয়। গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খতনা, কান ফোঁড়ানো, সখি পাতানো ইত্যাদি উপলক্ষেও মেয়েলি গান রচিত ও গীত হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বিরহ ও নাইয়রকেন্দ্রিক গীতও আছে। এসব গীতে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুঠে ওঠে। মেয়েলি গীত বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত।